মিথ ও তার বিনির্মাণ : প্রসঙ্গ সন্তোষ কুমার ঘোষের ‘কানাকড়ি’ এবং মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’

আদর্শ কুমার

গবেষক, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়

Gmail- kadarsha156@gmail.com

সারাংশ :

‘মিথ’ শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ‘মাইথোস’ থেকে, যার অর্থ ‘শব্দ’ বা ‘লোককথা’ বা ‘সত্য ঘটনা’। ‘মিথ’ শব্দটি অন্য একটি শব্দের সঙ্গে জড়িত তা হল ‘মিও’ যার অর্থ ‘শেখানো’ অথবা ‘গোপন রহস্যের সন্ধান’। পুরাণের যেসব গল্প সর্বজন গ্রাহ্য, সর্বজনমান্য, সর্বজন হিতায়চ, তাই মিথ। আসলে মিথ হচ্ছে বর্তমান সময়ে ইতিহাসকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, সূত্রহীন সময়ের শৃঙ্খল মিথ। এর মূল ঐতিহ্য প্রাচীন। আমাদের সমাজ ও মানব-মন -এই দুই দিয়ে মিথকে বিচার করা যায়। মূলকথা হল, মিথ হচ্ছে সেই ভিতরে থাকা আর্কেটাইপ, ভিতরে থাকা এক পুরাণ সত্য, যেটা আমাদের বর্তমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এর সঙ্গে গঠিত। তাই বলা যায়, মিথ হচ্ছে আমাদের সমাজ-মন থেকে গড়ে ওঠা একটি নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় এবং তার বন্ধনটা হচ্ছে সূত্রহীন সময়ের বন্ধন।

আমরা ‘কানাকড়ি’ গল্পে দেখতে পাই কিভাবে আর্থিক সংকট নারীকে পিতিত ও বিপথগামী করেছে, আর তার বিশ্বাসের ভিতটিও ভেঁঙে দিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। আসলে বর্তমান সাবিত্রীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছ থেকে তাদের নিজস্ব দাবি আদায় করতে পারে না; তার কথায় গল্পকার গল্পে পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে বলেছেন। অন্যদিকে ‘দ্রৌপদী’ গল্পে দ্রৌপদী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে স্বার্থপর সমাজের বিরুদ্ধে নারীর একলার সংগ্রামের কথা ফুটে উঠেছে। আধুনিক সমাজে সাহায্যকারী কৃষ্ণের বড়ই অভাব। আর তার জন্যই মহাশ্বেতা দেবী মহাভারতের ‘দ্রৌপদী’ নামটি গ্রহণ করেছেন।

তাই পৌরাণিক দ্রৌপদী আধুনিক প্রতিকূলতার আলোকে আরো প্রকট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। এখানেও আমরা মিথের প্রয়োগ লক্ষ করি।

সূচক শব্দ : সর্বজনমান্য, সর্বজন হিতায়চ, সূত্রহীন সময়ের শৃঙ্খল, প্রত্নকাঠামো, সমকালীন সাবিত্রী, মনোরমা থাংযাম।

মূল প্রবন্ধ :

প্রথমেই আমাদের প্রশ্ন 'মিথ' কথাটির অর্থ কী? এর উৎপত্তিই বা কোথার থেকে? আসলে 'মিথ' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'মাইথোস' থেকে, যার অর্থ 'শব্দ' বা 'লোককথা' বা 'সত্য ঘটনা'। এর থেকে বোঝা যায় মিথ মানুষের মুখে মুখে পরম্পরায় চলে আসা সত্য ঘটনা। 'মিথ' শব্দটি অন্য একটি শব্দের সঙ্গে জড়িত তা হল 'মিও' যার অর্থ 'শেখানো' অথবা 'গোপন রহস্যের সন্ধান'। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে হোমার এই অর্থেই 'মিথ' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন তাঁর 'ইলিয়াড' নামক গ্রন্থে।

সাধারণ অর্থে মিথ বলতে আমরা কী বুঝি? এর উত্তরে বলা যায়, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের রূপকথা, উপকথা, লোককথা বা পৌরাণিক গল্প। এছাড়া এমন সব গল্পকে আমরা মিথ বলে থাকি যা সমাজ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত সেই সমস্ত গল্প, যা বানোয়াট। এখন আমাদের মনে হতে পারে তাহলে মিথ আসলে কী? তা কি কেবলই অনুবর্তন? না, তা অনুবর্তন নয়। মিথের সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। অনেকে ভাবেন, যা আমাদের প্রাচীন তাই মিথ। আবার কারও কারও মতে, যা ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই মিথ।

পুরাণের যেসব গল্প সর্বজন গ্রাহ্য, সর্বজনমান্য, সর্বজন হিতায়চ, তাই মিথ। রবীন্দ্রনাথের একটি পংক্তি থেকে অনায়াসে মিথের পরিচয় পাওয়া যায় যে, পিতামহদের কাহিনী লিখেছ মজ্জায় মিশিয়ে। পিতামহ বা আদি পুরুষের কাহিনি যখন আমাদের মজ্জায় মিশে যায় তখন তৈরি হয় মিথ। এটি একটি বিশেষ সংস্কৃতি বলয় এর অন্তর্গত, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান-বিশ্বস।

আসলে মিথ হচ্ছে বর্তমান সময়ের ইতিহাসকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় সূত্রহীন সময়ের শৃঙ্খল হল মিথ। এর মূল ঐতিহ্য প্রাচীন। আমাদের সমাজ ও মানব-মন -এই দুই দিয়ে মিথকে বিচার করা যায়। মূলকথা হল, মিথ হচ্ছে সেই ভিতরে থাকা আর্কেটাইপ, ভিতরে থাকা এক পুরাণ সত্য, যেটা আমাদের বর্তমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এর সঙ্গে

গঠিত। তাই বলা যায়, মিথ হচ্ছে আমাদের সমাজ-মন থেকে গড়ে ওঠা একটি নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় এবং তার বন্ধনটা হচ্ছে সূত্রহীন সময়ের বন্ধন।

ইংরেজি 'Myth' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় 'পুরাণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে মিথ ও পুরাণ কি একই বিষয়? এর পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারা যায় মিথ ও পুরাণ এক নয়। পুরাণ লিখিত সাহিত্য মিথ তৈরি হয় মানুষের মনে এবং মুখে মুখে। পুরাণ হল- "বেসাদিমুনি রচিত বা সর্গ, প্রত সর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটি লক্ষনে বিশেষিত।"[১] অন্যদিকে চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত মিথ ও পুরাণের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন- "মিথ এবং পুরাণ ঠিক সমার্থবোধক না হলেও ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাধারণ ভাবে এদেরকে পরস্পরের প্রতিশব্দ বলেই ধরে নিই আমরা। কিন্তু ভারতীয় অর্থে যাকে পুরাণ বলা হয় তার উপকরণগত ব্যাপ্তি মিথের চেয়ে অনেক বেশি। পুরাণের মধ্যে মিথ সুলভ উপকরণের পাশাপাশি, কিংবদন্তী, ধর্মীয় প্রতীতি ও বাস্তব ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ একত্রিত হয়ে থাকে।"[২] এই কথার ভিত্তিতে আমরা মিথ অর্থে যেমন 'পুরাণ' শব্দটি ব্যবহার করতে পারি, তেমনি বুঝতে পারি, পুরাণের একটি উপাদান হচ্ছে মিথ। আবার চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্তের কথা অনুযায়ী বলাযায়- "পুরাণ মূলত ধর্মীয় অনুষঙ্গ টিকে উত্তরকাল পর্যন্ত নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রাখে। মিথ তার বাইরের আবরণটা পাল্টাতে চলে এলেও পুরাণের বহিরঙ্গটি কিন্তু মোটামুটি ভাবে অপরিবর্তিতই থেকে যায়।"[৩] ঠিক এই কারণেই আমরা দেখতে পাই মিথ ও পুরাণ চর্চার ক্ষেত্রে এক বিশাল তারতম্য। আর সেই কারণে মিথের অন্বেষণ একান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আসলে আমরা বলতে পারি মানুষের ইতিহাসে ব্যবহারিক সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তন ঘটে, সেই সমস্ত উপলক্ষগুলিকে গল্পের আকারে একটি জাতি নিজের মতো সঞ্চিত করে রেখেছে তাদের ঐতিহ্যের পরম্পরার মধ্যে; এগুলি তাদের মধ্যে এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে রাখে যার ফলে সমাজ-মনের গভীরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে।

আমরা যদি বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, অনেক সাহিত্যিক সেই সময় দাঁড়িয়ে পুরাণ বা মিথের ব্যবহার করেছেন আমাদের নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প, কবিতার মধ্যে। তাঁদের মধ্যে হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত , বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ। তাঁরা তাঁদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পুরাণের ব্যবহার করেছেন।

তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, সাহিত্যে মিথের প্রয়োজনীয়তা কী বা কেন? এ কথা ঠিক যে মিথ বা পুরাণ শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ধর্মীয় ভাবনা বা অলৌকিকতা, যা বিজ্ঞান এর বিপরীত। তাই মানুষের মনে বিপ্রতীপতার উদঘাটনে মিথ সাহায্য করে। আবার চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত বলেছেন- "পুরাণের কাহিনির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে থাকে মানুষের মানসলোকের সুগভীর কতগুলি ধ্রুব ও বাস্তব প্রতীতি। তাই চলমান সময়ের বিবর্তনে মিথের বাইরের রূপটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও, আদতে সেটি থেকে যায় মানুষের চিরকালীন ঋকথ হিশেবে।"[৪] আমরা বলতে পারি আধুনিক সমাজ-সংঘাতকে, সমকালীন বিশ্বরাজনীতির ওঠাপড়াকে বেঞ্জিত করা, সামাজিক শ্রেণি দ্বন্দ্বের কথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক বিপর্যয় প্রসঙ্গ তুলে আনার জন্য মিথ বা পুরাণ রূপকে ব্যবহার করে থাকেন সাহিত্যিকেরা।

এখন আমাদের মনে হতে পারে, আধুনিক সাহিত্যে মিথ কী অপরিবর্তিতভাবে এসেছে? এর উত্তরে বলা যায় 'না' তা নয়, তা আসে পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে। স্থানিক কালিক ভেদে মিথের রূপভেদের রূপান্তর ঘটে। মিথ কালে কালে কালাতীত রূপে নিজেকে বারংবার সৃজন করে। চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত মিথের পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে বলেছেন- "আমাদের সামাজিক জনগোষ্ঠীর মানুষের ভাবনার মধ্যে মিথের কাহিনির মূল কাঠামোটি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও, তার সঙ্গে প্রত্যেক শিল্পীরই নিজস্ব মানসিকতা (যা গড়ে ওঠে পরিবার, পরিবেশ, শিক্ষাদীক্ষা এবং নিজস্ব প্রতিভার কারণে ও মাধ্যমে) এটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। আর সেই দ্বান্দ্বিকতা মূল মিথীও প্রত্নকাঠামোর ওপর এক রূপান্তরিক বিচিত্রতাকে অন্বিত করে। এই ভাবেই ঐতিহ্যকে শিকড়ে অনুভব করেও নতুন সৃষ্টি দিগন্তের নানা দিকে তার ডালপালা দেয় মেলে।"[৫] আসলে সাহিত্যে মিথের প্রয়োজনীয়তা হয়, আধুনিক যুগ রুচী, দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিবোধ, কাল চেতনা, সমকালীন সামাজিক-মানসিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, শোষণ পিড়ন - এসবকে আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। এক কথায় বলা যায় মিথকে মানুষ গ্রহণ করেছে আধুনিক সময়ের উপযোগী করে। আর এই মিথের প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই সন্তোষ কুমার ঘোষ এর 'কানাকড়ি' গল্পে।

'মহাভারতে'র 'বন পর্বে' 'সাবিত্রী উপাখ্যান' রয়েছে, যা ভারতীয় সসমাজ-মনে গড়ে তুলেছে 'সতী নারীর' ধারণা। আর এই সতী হবে পতিপরায়ণা, শ্বশুর-শাশুড়ি নিষ্ঠ-প্রানা; অভাব-অনটন দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও থাকবে না তার নিজস্ব কোনো চাহিদা, শুধু চেয়ে থাকবে তার স্বামী ও সংসারের দিকে। এই পতিপ্রানা নারীর উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভারতীয় নারীদের প্রতি এক আশীর্বাদ বাণী

'সতী সাবিত্রী হোউ' যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই পরিচায়ক। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই আখ্যান আমাদের বংশপরম্পরায় ফল্গুধারার মতো মজ্জায় মিশ্রিত একটি অঙ্গ, যা সৃষ্টি করেছে মিথের।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত 'মহাভারতে'র 'বন পর্বে' 'পতিব্রতা মহাত্ম্য পর্বাধ্যায়'এ আমরা পাই সাবিত্রী উপাখ্যানের কথা। রাজা যুধিষ্ঠির মার্কেন্ডেয় মুনিকে প্রশ্ন করেন "আপনি কি এই দ্রুপদনন্দিনীর তুল্য পতিব্রতা রমণী কুত্রাপি দৃষ্টি বা শ্রবণ গোচর করিয়াছেন?"[৬] তখন তিনি সাবিত্রী উপাখ্যানের কথা রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলেন।

এই উপাখ্যানে আমরা জানতে পারি সাবিত্রী কিভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের মানসিক শক্তিকে স্থির রেখে বাকচাতুর্যের দ্বারা যমের কাছ থেকে তার স্বামীর প্রাণ-যতী ফিরিয়েছে, তেমনি ফিরিয়েছে তার শ্বশুরের হৃত রাজত্বকে ও তাঁদের দৃষ্টিশক্তি। অন্যদিকে পুত্রহীন পিতার জন্য বর আদায় করে নিয়েছে পুত্র লাভের।

কিন্তু বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি এতটাই দুর্বিষহ যে সমকালীন 'সাবিত্রী'দের দারিদ্র, লাঞ্ছনা, রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে নিত্যদিন। এক কথায় এই নারীরা যেমন শারীরিকভাবে নিপীড়িত তেমনি মানসিকভাবেও। বর্তমানে সামাজিক নারী তার পরিবারকে সচ্ছলভাবে চালিত করার জন্য বিপথগামী হতেও 'রাজি'। আমরা যদি সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কানাকড়ি' গল্পটি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব গল্পের সতীসাধ্বী রমণী সাবিত্রী তার স্বামী ও কন্যা সন্তানের জন্য কিভাবে তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেয়েছে, যার জন্য বর্তমান সমাজের কুৎসিত রূপটি দায়ী। গল্পের সাবিত্রীর লড়াইয়ের মাধ্যমে গল্পকারর পৌরাণিক সাবিত্রীর উপাখ্যানের পুনর্নির্মাণ করেছেন।

'মহাভারতে'র সাবিত্রী যেমন পতিপরায়ণা গল্পের সাবিত্রীও তাই। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি অফিস থেকে ফেরার পর মন্মথর ডাক-'সাবিত্রী'। এই ডাকটি যেমন তার ভালবাসার, তেমনি সাবিত্রীর প্রতি নিষ্ঠা ও সাবিত্রীর প্রতি বিশ্বাসের পরিচায়ক। পাশের ঘরে নষ্ট চরিত্রের মেয়ে থাকে জেনে সাবিত্রী, সতীত্ব রক্ষার জন্য স্বামীকে বলেছে- "আমি এখানে থাকব কি করে বলোতো।"[৭] স্বামীর মঙ্গলকামনায় "জানালায় আয়না রেখে সাবিত্রী কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরছিল।"[৮] আর তাই এক সময় সাবিত্রীর সতীত্বে বিশ্বাসী মন্মথ বলেছে- "আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি... আমাকে তুমি চেন, আমিও জানি তুমি কী"[৯]

'মহাভারতে' আমরা সাবিত্রীর দৈহিক বর্ণনা সম্পর্কে পাই- "তৎকালে লোকে তাঁহাকে সুমব্যমা, নিবিড় নিতম্বিনী ও কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া বোধ করিতে লাগিল যে, বুঝি দেবকন্যা মানব রূপ ধারণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"[১০] গল্পেও আমরা পাই সাবিত্রীর লাবণ্যময়ী রূপ যে ছিল তার কথা। যখন শশাঙ্ক স্তন্যদায়িনী সাবিত্রীকে স্পষ্ট সামনাসামনি দেখেছে এবং তার লোলুপতা মল্লিকার মুখ থেকে বার হয় "কী বলব, ওর মাথা ঘুরে গেছে একেবারে।"[১১] এই 'মাথা ঘুরে' যাওয়া শব্দে নিহিত রয়েছে সাবিত্রীর অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা।

মহাভারতে আছে নারদ মুনির কাছ থেকে সাবিত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর দিন জানতে পারে। "যখন দেখিলেন প্রাণেশ্বরের প্রাণ পতনের আর মাত্র চারদিন অবশিষ্ট আছে তখন তিনি ত্রিরাত্র-ব্রত অবলম্বন করিলেন।"[১২] এই ব্রত অবলম্বন করে সাবিত্রী "...ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত কৃশা হইতে লাগিলেন।"[১৩] কিন্তু গল্পের সাবিত্রী কৃষা হয়েছে স্বামীর উপার্জন হীনতা ও অভাবের তাড়নায়। বর্তমান অবক্ষয়িত সমাজে সাবিত্রীদের উপবাস করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, না হয় কয়েকটি ভাতের সাথে খেতে হয়েছে 'কলমি শাক'। গল্পের শেষ দিকে সাবিত্রীর শারীরিক অবক্ষয়ের পরিচয় আমরা পাই। যে সাবিত্রীকে দেখে শশাঙ্কের একসময় মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সেই সাবিত্রীকে কাছে পেয়েও আর তার মনে তেমন কোন সাড়া জাগে নি। সাবিত্রী শারিরীক বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার বলেছেন-"চুল উঠে যাওয়া প্রশস্ত কপাল, কালো রেখার পরিখার আড়ালে বসে যাওয়া দু'টি নিস্প্রভ চোখ, গালের উঁচু হাড়, প্রকট কণ্ঠাস্থি, শিরা বেরুনো লিকলিকে হাত, সমতল বুকের কবরে দু'টি বোঁটায় স্তনের এপিটাফ।"[১৪] আসলে বর্তমান সমাজের আর্থিক লাঞ্ছনার কারণে সাবিত্রীদের জীবনে বার বার নেমে এসেছে দূর্বিপাক। তাই গল্পের পতিব্রতা সাবিত্রী তার কন্যা সন্তান ও স্বামীকে দারিদ্র নামক রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বিপথগামী হতে চেয়েছে। আর সেই কারণেই মল্লিকার সিনেমার টিকিট নিয়ে, গেছে শশাঙ্কের সাথে সিনেমা দেখতে। শশাঙ্কের হাতের থাবার স্পর্শের জন্য "মনটাকে প্রস্তুত করল"[১৫] সে।

'মহাভারতে' যখন সত্যবানের মৃত্যুহয়-"তখন সেই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে বন্ধন ও গ্রহণপূর্বক দক্ষিণ দিকে চলিলেন।"[১৬] আমাদের মনে হয় 'যম' হল চাকরি যাওয়ার পরিস্থিতি বা বিপরীত সময় যা তাকে 'পশ্চিম' রূপী অভাব-অনটন, দুঃখ-যন্ত্রণা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উপস্থিত করেছে, যা তার মানসিক স্খলনের জন্যেও দায়ী। এই যমের হাত থেকে 'মহাভারতে'র সাবিত্রী ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল তার মৃত স্বামী সত্যবানের জীবন। আবার দুই(শ্বশুরপক্ষ, পিতৃপক্ষ) পক্ষেরই পারিবারিক সচ্ছলতা

আদায় করেছিল তার দার্শনিক চিন্তা প্রসূত উচ্চতর বাকভঙ্গির মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমান সময় এতটাই প্রতিকূল বা পুরুষতান্ত্রিক যে আধুনিক সামাজের সাবিত্রীর মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে ভাষা। তাই গল্পকার বলেছেন- "...ওর কথা বলার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে।"[১৭]

তাই আমরা বলতে পারি আমাদের সমাজ-মনে 'সাবিত্রী'র মিথ যেভাবে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, তা নারীদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু তা লালনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক, মানসিক ও অর্থনীতির অবক্ষয়ীত রূপটি। মসনদে বসে থাকা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের প্রভাবে বর্তমানের সাবিত্রীরা তাদের বাগশক্তি হারিয়েছে। নিজেদের অধিকারের দাবি জানাতে পারেনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে। আর পারলেও তা পর্যবসিত হয়েছে ব্যর্থতায়। আর গল্পের সাবিত্রী পারেনি বলেই 'মহাভারতে'র সাবিত্রী নামক উপাখ্যানের পুনর্নির্মাণ ঘটিয়েছেন গল্পকার সন্তোষ কুমার ঘোষ তাঁর 'কানাকড়ি' গল্পে।

এবার আসি 'দ্রৌপদী' গল্পের কথায়। গল্পটি আমরা যদি পাঠ করি, তাহলে দেখতে পাব মহাশ্বেতা দেবী সৃষ্টি করেছেন এক নবপুরাণ বা মিথের। লেখিকা নিজেও বোঝেন 'দ্রৌপদী' নামটি সাঁওতাল সমাজের প্রথাগত নয়। "এক তকমাধারী : সাঁওতালীর নাম দ্রৌপদি ক্যান? আমি যে নামের লিস্টি লইয়া আইসছি তাতে তো এমুন নাম নাই? লিস্টিতে নাই এমুন নাম কেউ থুইতে পারে?"[১৮]

সূর্য সাহুতের মত পরিবারেও দ্রৌপদী নামটি অপ্রচলিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এর ঘটনাকে বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত করে তোলার প্রবণতা ছিল-কৌরব রাজসভায় দুঃশাসনের হাতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রকৃতপক্ষে যেন রাজ শক্তির হাতে ভারতবর্ষের নারী সমাজের লাঞ্ছনা। আর মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে দ্রৌপদী কৃষ্ণবর্ণের রমনীর আদি ভারতবাসী, বর্তমানকালে প্রশাসনের হাতে, রাষ্ট্রশক্তির হাতে নারীদের অবমাননা সত্য। প্রাচীনকাল থেকে সেই অত্যাচারের ধারায় বহমান-নামের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ঘটনার বাস্তবায়ন দেখিয়েছেন গল্পকার।

আসলে আধুনিক সমাজের তথা রাষ্ট্রের হাতে নারীর পিড়নের প্রতীক রূপে মহাভারতের দ্রৌপদীকে দরকার ছিল। গল্পের দ্রৌপদীকে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়েছে একলাই, যেখানে পুরাণে আমরা পাই পঞ্চপান্ডবের সাথে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন দ্রৌপদী। আসলে সার্থপর আধুনিক সভ্যতাযর বিরুদ্ধে দ্রৌপদীকে তার লড়াই লড়তে হবে একলাই। কৌরব রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এর সময় তার

সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন কৃষ্ণ। কিন্তু বর্তমান সমাজে এই কৃষ্ণকে আমরা পাই না, কারন স্বার্থপর পৃথিবীর অকৃতজ্ঞ মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি সমকালীন দ্রৌপদীকে। তাই দ্রৌপদীর লড়াই সমাজের সুশিক্ষিত অথচ সার্থপর ও সংগঠিত জোতদার প্রশাসকদের বিরুদ্ধে। আসলে বর্তমান সভ্যতায় 'কৃষ্ণ' নামক প্রতিবাদী সত্তার বড়ই অভাব।

গল্পের শেষে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন- "দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র তার টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[১৯] এর মধ্য দিয়ে এ কথাই বোঝা যায় যে, মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন তথাকথিত অসহায় নারীদের নিজস্ব স্বক্ষমতার মধ্য দিয়ে স্বাধীকার অর্জনের প্রচেষ্টা। এখানে মনে রাখা দরকার আধুনিককালের দ্রৌপদী পুরান ইতিকথার দাবার ছক উল্টে দেয়নি। বরং 'মহাভারতে'র যুদ্ধই দাঁড়িয়ে আছে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধের উপায় হিসেবে। আধুনিক ভারতবর্ষে ২০০২ সালে মনোরমা থাংযাম নামক মনিপুরী তরুণীকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈনিকরা ধর্ষণ করে, নির্মমভাবে যৌনাঙ্গে গুলি চালিয়ে হত্যা করে এর প্রতিবাদ জানাই মনিপুরী তরুণীরা উলঙ্গ হয়ে ভারতীয় সৈনিকদের কাছে গিয়ে।

'অমৃতলোক' পত্রিকা মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যায় প্রাবন্ধিক নবগোপাল রায় 'দ্রৌপদী বিবস্ত্রার রুদ্ধসংগীত' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে- সমাজ-ইতিহাস ও পুরাণকথার চেতনার স্ফুরণই যদি 'মিথ' সৃষ্টি হয়, তাহলে দ্রৌপদী গল্পে তার যথার্থ প্রয়োগে মহাশ্বেতা দেবী নবপুরাণ সৃষ্টি করেছে(নবগোপাল রায়, দ্রৌপদী-বিবস্ত্র রুদ্ধসঙ্গীত, অমৃতলোক পত্রিকা, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৮)।

অবশেষে বলা যায় 'মিথ' হলো Socio-psychological approach এর মধ্যে গড়ে ওঠা সুত্রহীন সময়ের শৃঙ্খল, যা সমাজ মানুষের রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলে উত্তরাধিকার সূত্রে। আর তাই আধুনিক সাহিত্যিকেরা এই পুরাণ বা মিথের পুনর্নির্মাণ করেছেন সমাজ ও সময়ের উপযোগী করে। আমরা 'কানাকড়ি' গল্পে দেখতে পেলাম কিভাবে আর্থিক সংকট নারীকে পিতিত ও বিপথগামী করেছে, আর তার বিশ্বাসের ভিতটিও ভেঁঙে দিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। তাই লেখক গল্পের শেষে বলেছেন- "এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কের কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথের কাছে ভেতরের মনটার। ...এত বড় দু'টো ভুল আজ একদিনে ভেঙ্গে গেছে।"[২০] আসলে বর্তমান সাবিত্রীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছ থেকে তাদের নিজস্ব দাবি আদায় করতে পারে না; তার কথায় গল্পকার নতুনভাবে বলেছেন। অন্যদিকে 'দ্রৌপদী' গল্পে দ্রৌপদী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে স্বার্থপর সমাজের বিরুদ্ধে

নারীর একলার সংগ্রামের কথা ফুটে উঠেছে। আর তার জন্যই মহাশ্বেতা দেবী মহাভারতের 'দ্রৌপদী' নামটি গ্রহণ করেছেন। তাই পৌরাণিক দ্রৌপদী আধুনিক প্রতিকূলতার আলোকে আরো প্রকট ও উজ্জ্বল।

তথ্যসূত্র :

১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সম্পাদিত), বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৭, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৩৬০

২. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, মিথ পুরাণের ভাঙ্গাগড়া, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭

৩. ২ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ১৯

৪. ২ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ২১

৫. ২ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ২৪

৬. মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, প্রথম খন্ড, প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৮০, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৬০

৭. সন্তোষ কুমার ঘোষ, সমস্ত গল্প, প্রথম খণ্ড, প্রকাশ- ১৯৯৬, স্বরলিপি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৫

৮. ৭ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৪২

৯. ৭ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৪৭

১০. ৬ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৭৬১

১১. ৭ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৫২

১২. ৬ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৭৬৪

১৩. ৬ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৭৬৪

১৪. ৭ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৬৩

১৫. ৭ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৬০

১৬. ৬ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৭৬৬

১৭. ৭ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৬১

১৮. মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬১

১৯. ১৯ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৭১

২০. ৭ নং তথ্যসূত্র ওই, পৃষ্ঠা ৬৫

সহায়ক গ্রন্থ :

- জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সম্পাদিত), বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৭, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা
- চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, মিথ পুরাণের ভাঙ্গাগড়া, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
- মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, প্রথম খন্ড, প্রকাশ- ফাল্গুন ১৩৮০, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা
- সন্তোষ কুমার ঘোষ, সমস্ত গল্প, প্রথম খণ্ড, প্রকাশ- ১৯৯৬, স্বরলিপি, কলকাতা
- মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা